BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 21-29

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস বিতর্ক

ড. সুদেষ্ণা বণিক

সারসংক্ষেপ

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাসের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য-পূর্ববর্তী সময় থেকেই রাধাকৃষ্ণের লীলা সংক্রান্ত পদ রচনায় ও এই সমস্ত পদে প্রেম ও ভক্তির সংমিশ্রণে দিব্যভাবের প্রকাশ ঘটানোয় চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব অতুলনীয়। স্বকীয় কাব্য প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে চণ্ডীদাস বাংলা পদাবলী সাহিত্যে ও আপামর বাঙালি মানসে এক অনন্যসাধারণ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। চণ্ডীদাসের পদাবলী স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকেও অপার্থিব আনন্দে আপ্লুত করত। তাই পদাবলী সাহিত্যের এই মহান স্রষ্টা যুগের পর যুগ ব্যাপী বাঙালি সুধী সমাজের আলোচ্য ব্যক্তি ও জনমানসের হৃদয়ের কবি হিসেবে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

তবে বৈষ্ণব সাহিত্যে এই 'চণ্ডীদাস' নামের অন্তরালে একাধিক বা বহু ব্যক্তির অস্তিত্ব বর্তমান। প্রাক্ চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে 'চণ্ডীদাস' নামের একাধিক কবি থাকায় পদাবলী সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা দুষ্কর। যদিও চৈতন্যোত্তর কালের 'চণ্ডীদাস' নামধারী কবিরা কেউ 'দীন', কেউ 'সহজিয়া' উপাধি ব্যবহার করেছেন বলে তাঁদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু মূল সমস্যা হল প্রাক্ চৈতন্য যুগের চণ্ডীদাস, যিনি তাঁর রচনাশৈলী দ্বারা মহাপ্রভুকেও ভাবাবেশে আচ্ছন্ন করতেন, তাঁর পরিচয় উদ্ধার করে তাঁকে চিহ্নিত করা। আলোচ্য গবেষণা পত্রের মূল উদ্দেশ্য হল বৈষ্ণব পদাবলীর সর্বাধিক সম্মানিত ও আদৃত পদকার চণ্ডীদাস সম্পর্কে পূর্বাপর গবেষণা ও আলোচনার নিরিখে একটি সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

ড. সুদেষ্ণা বণিক
পিএইচডি (কণ্ঠসঙ্গীত, কীর্তন)
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: banik_sudeshna13@.yahoo.com

মূলশব্দ

কীর্তন, পদাবলী, মহাজন, পদকর্তা

ভূমিকা

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ পদ রচয়িতাদের বলা হয় মহাজন। যেকোনো পদ রচনায় উদ্দিষ্ট তথা প্রধান বিষয় যদি হন ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীমতি রাধারানী অথবা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, তবে অন্য প্রধান

ব্যক্তি হলেন স্বয়ং পদকর্তা তথা মহাজন যিনি ভণিতায় অর্থাৎ পদের শেষাংশে নিজের নামটি উল্লেখ করেন। আজও পদাবলী কীর্তন পরিবেশনকালে পদকর্তার নামোচ্চারণের সময় গায়ক ও বাদকগণ মাথা নত করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে কয়েকজন পদকর্তা তথা মহাজনকে বিশেষ মান্যতা দেয়া হয়। এর প্রধান কারণ তাঁদের অবিস্মরণীয় রচনাশৈলী, অপার্থিব ভক্তিভাব, অপূর্ব শব্দচয়ন ও ইষ্টের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ ইত্যাদি। আরও একটি বিষয় এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে থাকে, আর সেটি হল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেগ। এটি বিশেষত চৈতন্য পূর্ববর্তী মহাজনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর এই প্রসঙ্গে যাঁদের নাম উল্লেখ্য তাঁরা হলেন কবি জয়দেব গোস্বামী, বিদ্যাপতি ঠাকুর এবং চণ্ডীদাস। আমাদের বর্তমান গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেন এই চণ্ডীদাস যাঁর পদ শ্রবণ করে মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন।

পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণামূলক প্রবন্ধে পূর্বতন গবেষণা গ্রন্থসমূহ থেকে বিভিন্ন মতবাদ বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে একটি নতুন মত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। এখানে মূলত বর্ণনামূলক পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে।

বিশ্লেষণ

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখা মানুষ মাত্রেই জানেন যে এখানে পদকর্তা চণ্ডীদাস বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আবার আমরা এটাও জানি যে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এই 'চণ্ডীদাস' নামে একাধিক বা বহু ব্যক্তি রয়েছেন। তবে চৈতন্যোত্তর যুগে 'চণ্ডীদাস' নামধারী কবিরা নিজেদের নামের পূর্বে বিভিন্ন উপাধি ব্যবহার করেছেন বলে তাঁদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু মূল সমস্যা হয় প্রাক্ চৈতন্য যুগের চণ্ডীদাসকে নিয়ে যিনি তাঁর রচনার মাধুর্যে মহাপ্রভুকে ভাবাবেগে আচ্ছন্ন করতেন। এই চণ্ডীদাস এক ছিলেন না একাধিক ব্যক্তি, সেটা নিরূপণ করাই আমাদের বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য।

যদিও এই বিষয়ে বিশিষ্ট গুণীরা তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন আপন আপন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে, তবুও প্রামাণ্য অভাবহেতু তাঁরা কেউই সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। আমরা সেইসব মতবাদের একটা সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করে ও বিভিন্ন ঘটনার সম্ভাবনার দিক তুলে ধরে এই সমস্যার এক সাধারণ যুক্তিনির্ভর আনুমানিক সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

চণ্ডীদাস রচিত পদসমূহ সম্পর্কে বিশিষ্ট বাংলা ভাষাবিদ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড)' গ্রন্থে বলেছেন, "...চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙালির কাছে পরম ভক্তি, আরাম ও আনন্দময় শিল্পরসে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদে বাঙালি বিস্মিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে সে মনের প্রশান্তি, স্নিগ্ধতা ও আত্মনিবেদনের একনিষ্ঠতা খুঁজিয়া পাইয়াছে; চণ্ডীদাসের পদাবলী তাই শুধু পদাবলী মাত্র নহে, সারস্বত বৈশিষ্ট্যই ইহার একমাত্র ফলশ্রুতি নহে...।"[১] বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক শ্রী দীনেশচন্দ্রের

একটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন, "চণ্ডীদাসের ভাবসম্মেলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়। ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধহয় অন্যায় হইবে না। সেগুলির মতো প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্মপুস্তকেও বিরল।"[২] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরেক পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি'-তে বলেছেন, "চণ্ডীদাস কবিতাপস। এত অনাবরণ, অনির্বাণ, আত্মবান কবি আর কে?.....এত শান্ত, সুস্থির, শিশিরবিন্দুর সুকুমারতায় স্নিগ্ধ পদকার আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। চণ্ডীদাসের পদে করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ার অমর প্রেমের দীপশিখা।"[৩]

চণ্ডীদাস সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের মহাজ্ঞানী গবেষকদের এমন আলোচনা তথা বিশ্লেষণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে বাংলা পদাবলী সাহিত্যে তাঁর গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটা। তাই তো যুগের পর যুগ ধরে চণ্ডীদাস সম্পর্কে পাঠককুলের প্রচণ্ড কৌতূহল বিদ্যমান। এই মহান কবির প্রকৃত জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে তাঁকে নিয়ে অজস্র কল্পকাহিনী ও গল্পগাথা গড়ে উঠেছে। 'চণ্ডীদাস' নামের মাহাত্ম্যে প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীতে তাঁরই মত মহত্ত্ব ও অমরত্ব অর্জনের লক্ষ্যে বহু কবি এই নাম ধারণ করে বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। ফলে বিভিন্ন পদাবলীর ভণিতা তথা শেষাংশে বড়ু, দ্বিজ, দীন ইত্যাদি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। একইভাবে তাঁর জীবন কাহিনীর ক্ষেত্রেও বহু কথিত তথা কল্পিত ঘটনার এমন মিশ্রণ ঘটেছে যে এর থেকে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব।

চণ্ডীদাসের পদাবলী আপামর বঙ্গ সমাজে এতটাই জনপ্রিয় যে তাঁর সম্পর্কে সমালোচকদের মুগ্ধতাও অবিসংবাদিত। কিন্তু এই মুগ্ধতা হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয় যখন ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) বনবিষ্ণুপুরের নিকটস্থ কাঁকিল্যা নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস রচিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। এই পুঁথির আবিষ্কর্তা শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মহাপণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। তিনি এবং প্রসিদ্ধ লিপিতত্ত্ব বিশারদ ও ঐতিহাসিক শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় উক্ত পুঁথির লিপি বিচার ও বিশ্লেষণ করে একে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন বলে মত প্রকাশ করেন। এই মতের ভিত্তিতেই তাঁরা উল্লিখিত গ্রন্থের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসকেই আদিতম চণ্ডীদাস বলে স্বীকৃতি দেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পূর্বোক্ত গ্রন্থটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম নিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। আর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই পাঠক ও বোদ্ধামহলে তীব্র বিস্ময় ও বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। কারণ এই গ্রন্থের ভাব ও ভাষা পূর্ব-প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর প্রায় বিপরীত। এই প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "...বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্বে আবির্ভূত হইয়া ভাগবত অবলম্বনে প্রচুর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বসহ রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক এক বিরাট আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই লীলার বিন্যাস ও পর্যায় মোটামুটি পুরাণ-অনুসারী; কবি 'গীতগোবিন্দে'র দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং কোনো কোনো স্থলে স্থানীয় লোকসংস্কারকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। অলংকারশাস্ত্র, পৌরাণিক কাহিনী, সংস্কৃত ভাষা ইত্যাদিতে তাঁহার সবিশেষ নিপুণতা ছিল। অবশ্য তাঁহার রুচি আধুনিককালের পাঠকের প্রীতিকর হইবে না। বিশেষত যাঁহারা পদাবলীর চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের ভাবরসে অভিষিক্ত, তাঁহারা এই কাব্যে

জুগুপ্সা ও রসাভাস লক্ষ্য করিয়া বিষণ্ন হইবেন। সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষণী'র টীকায় "শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ" উক্তিতে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডকে নির্দেশ করা হইয়াছে কিনা সুদৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে তাহা বলা যায় না। চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের এই আখ্যানকাব্য আস্বাদন করিতেন, অথবা করিতেন না, তাহাও জোর করিয়া বলা মুশকিল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের কিছু কিছু পদে প্রাণঢালা বেদনার সুর যে নাই, তাহা নহে...সে সমস্ত পদে চৈতন্যদেবের বিরহতাপিত চিত্ত কথঞ্চিত শান্তিলাভ করিতে পারিত। কিন্তু কাব্যপরিকল্পনায়, কৃষ্ণচরিত্রাঙ্কনে ও বৃন্দাবনখণ্ডের পূর্ববর্তী খণ্ডসমূহে কাহ্ন ও রাধাচন্দ্রাবলীর ব্যবহার, উক্তি ও আচরণে সংগতি রক্ষিত হয় নাই, অলংকারশাস্ত্রমতে এই সমস্ত বর্ণনার অনেক স্থলেই রসের ব্যতিক্রম হইয়াছে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যাইতেছে যে, রসাভাসযুক্ত কাব্য শুনিলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন। এইজন্য মহাপ্রভুকে কোনো রচনা শুনাইবার পূর্বে স্বরূপ-দামোদর তাহা পাঠ করিয়া দেখিতেন, তাহাতে কোনও প্রকার রসের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে কিনা। চৈতন্যদেবের মনোভাব বিচার করিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত রাধার প্রতি কৃষ্ণের বলপ্রকাশ এবং স্থূল দেহাসক্তির অমার্জিত বর্ণনায় মহাপ্রভুর বিরহলীন চিত্তের প্রদাহ বাড়িত বৈ কমতো না। বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা ও বাকরীতির মধ্যে একটা বলিষ্ঠ, স্থূল ও অমার্জিত স্বাভাবিক গ্রাম্যতা আছে, যাহার বিচিত্র রস বিস্ময়কর, শিল্পকৌশলও নিন্দনীয় নহে; কিন্তু ঠিক এই উদ্দাম দেহসম্ভোগজনিত অনাবৃত আকাঙ্ক্ষার উত্তপ্ত ফেনোচ্ছ্বাস মহাপ্রভু কতটা সহিতে পারিতেন, তাহাও চিন্তার বিষয়।"[৪]

আবার পূর্বেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠা চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "ইহার ভাব ও ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে সাত্ত্বিক প্রেম আছে, মদনজ্বালা নাই।"[৫]

কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনার মতই এর স্বপক্ষ-সমালোচনাও বিরল নয়। মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আদিতম নিদর্শন হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা ও বাচনভঙ্গির স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন একাধিক জ্ঞানীজন। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কীর্তন বিশেষজ্ঞ ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অগ্রগণ্য। তিনি সর্বাগ্রে অধিকারভেদের প্রশ্ন তুলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমস্তরকম বিরুদ্ধ সমালোচনাকে নস্যাৎ করেছেন। উপরন্তু তিনি তাঁর 'বীরভূমি বিবরণ' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাস পদাবলীর পদসমূহকে তুলনা করে দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রমাণ করেছেন এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন পদই সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়ে প্রচলিত ও জনপ্রিয় চণ্ডীদাস-পদাবলীতে রূপান্তরিত হয়েছে। অতএব, মহাপ্রভু ভাবোন্মাদ অবস্থায় এই বড়ু চণ্ডীদাসের পদ শ্রবণেই শান্তি পেতেন।

মধ্যযুগের ভাষা ও সাহিত্যরীতির নিরিখে এই কথা অনায়াসে বলা যায় যে সেইসময় সংস্কৃত সাহিত্যে আদিরসের সহজ ও সাবলীল বর্ণনাই ছিল প্রচলিত রীতি। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে যে কোনো আদি রসাত্মক বর্ণনাই আমাদের কাছে দূষণীয় মনে হলেও সেই যুগে এ বিষয়ে কবি, পাঠক ও সমালোচকেরা উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এর কারণ বোধহয় যুগভেদে ও স্থানভেদে জনরুচির বিবর্তন। ঠিক এই কারণেই মধ্যযুগের 'কবিসার্বভৌম'[৬] বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ সূচক পদসমূহ তাঁর নিজ রাজ্য মিথিলায় অবহেলিত ও

অনাদৃত হয়েছিল নিছক শৃঙ্গার রসাত্মক পদ বা গান হিসেবে। অথচ বাঙালি বৈষ্ণব ভক্ত ও মহাজনেরা সেইসব পদ নিজেদের হৃদয়ের মণিকোঠায় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। আবার আদি রসাত্মক কাব্যের নিরিখে বিচার করতে গেলে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-ও সে দোষ থেকে মুক্ত নয়। অথচ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতির পদসমূহে ও গীতগোবিন্দের পদে বিশুদ্ধ ভক্তি ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ খুঁজে পেয়েছেন। তাই 'অশ্লীল আদি রসের ভাঁড়ারি' বলে শুধুমাত্র বড়ু চণ্ডীদাসকেই আখ্যায়িত করা বা তাঁকে ব্রাত্য করা বোধহয় খুব একটা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সংগীত গবেষক শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন, "শৃঙ্গারবহুল গীতগোবিন্দ শৃঙ্গাররসকে অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠতর রসলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মানব-হৃদয়ের চিরন্তন দুঃখ এবং চিরন্তন প্রাপ্তি এই দুটিকেই উদ্ঘাটিত করে প্রেমের একটা শাশ্বত রূপকে তুলে ধরেছেন। এতখানি আত্মসম্বরণ, এতখানি আত্মসমর্পণ, এত আনন্দ, এত দুঃখ- কোনোটাই গীতগোবিন্দের পরিকল্পনায় নেই। জয়দেবের পরিকল্পনায় ছিল সম্পূর্ণ সম্ভোগ আর বড়ু চণ্ডীদাসের পরিকল্পনায় ছিল সম্ভোগকে অতিক্রম করে আরও বড়ো পাওয়ার আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি বিরহ-খণ্ডের অবতারণা করেছেন। তথাপি গীতগোবিন্দ পরমসমাদরে শত শত বৎসর ধরে গীত হয়ে আসছে আর বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে।..... স্বয়ং শ্রীচৈতন্য জয়দেবকে প্রচার করে গেছেন সমগ্র দক্ষিণ ভারতে। কিন্ত প্রাদেশিক ভাষায় রচিত একজন গ্রাম্য কবির কাব্য এতটা পৃষ্ঠপোষকত্বের দাবি করতে পারে না এবং বাংলা ভাষায় এতটা কোমলকান্ত পদাবলীর সৃষ্টিও তিনি করতে পারেননি- বোধহয়, করা সম্ভবও ছিল না। এই কারণেই হয়তো সংস্কৃতের অনুরাগী শ্রীচৈতন্য ছন্দোবদ্ধ পদাবলী ছেড়ে বাংলা এই কাব্যটির প্রতি আকৃষ্ট হননি; হলে হয়তো গীতগোবিন্দের মতো এই গীতগাথাটিও স্মরণীয় হয়ে থাকত।"[৭] তবে একই সাথে তিনি এই আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন যে, এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটি হয়তো মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছয়নি। অর্থাৎ চৈতন্য-জীবনীকাব্যকে সঠিক বলে ধরলে চৈতন্য-পূর্ববর্তী আরো একজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। বহু জ্ঞানীজন মহাপ্রভুর প্রিয় চণ্ডীদাস পদাবলীর প্রসঙ্গে আর একজন চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাসের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন 'আদি চণ্ডীদাস' তথা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামে।

আবার ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়েছেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, শ্রী দীনেশচন্দ্র, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু, শ্রী বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রী নীলরতন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জ্ঞানীজন। এঁরা অধিকাংশই একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ঠিকই কিন্তু প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসকেই এক এবং অদ্বিতীয় বলে মেনেছেন। এর কারণ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে' ও 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুনঁতো বসী'৮, এই দুটি পদের সাথে 'রাধাবিরহ' পর্বের চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদের সাদৃশ্যকে দায়ী করা যায়। শুধু তাই নয়, সনাতন গোস্বামী বিরচিত 'বৈষ্ণবতোষণী'র টীকায় উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'দানখণ্ড' ও 'নৌকাখণ্ডের' উল্লেখও- 'শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।'[৯] তাঁদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে। "তাছাড়া, বড়ু চণ্ডীদাসের রচনারীতি যে চৈতন্য-পূর্ব যুগের ভাবধারাকেই সমর্থন করে, সেটাও বোধহয় একটা কারণ।"[১০]

শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের মত এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, "কৃষ্ণকীর্তনের আগেও জানা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাসের

নাম অনন্ত, তিনি 'বড়ু' উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং বাশুলী দেবীর আজ্ঞায় পদ রচনা করিতেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদেই বহু পূর্বে তাঁহার অনন্ত নাম পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার 'বড়ু' উপাধি ও বাশুলীর আদেশ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের সকলেই অবশ্য জ্ঞাত আছেন। সুতরাং কবি চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা যে একই অভিন্ন ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই।"[১১] আবার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন, "চণ্ডীদাস কি দুইজন ছিলেন? দুইজনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু? তাহা তো হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন বাঙলা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে।... আমার মতে কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস তাহা অস্বীকারের হেতু নাই, সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল। সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে একালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।"[১২]

ড হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংকলন'-এর ভূমিকায় লিখেছেন,

"আমরা এপর্যন্ত দুইজন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। একজন শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস, অন্যজন শ্রীচৈতন্য পরবর্তী দীন চণ্ডীদাস। একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই এই দুইজন কবির পদ পৃথক করা যায়। কিন্তু বড়ু ও দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন, 'চণ্ডীদাস' এই নামের অন্তরালে যে অন্য কবিদের পদ চলিতেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলিকে চিনিয়া লওয়া একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভাব ও রূপের পরিবর্তনে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, এমন পদেরও অভাব নেই। এই সমস্ত বিষয় আলোচনাপূর্বক আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ যথাসম্ভব পৃথকরূপে চিহ্নিত করিয়াছি।... বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানিকে আমরা প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া মনে করি। এইজন্য চণ্ডীদাস পদাবলীর উপযুক্ত শ্রেণীবিভাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকেই কষ্টিপাথর রূপে গ্রহণ করিয়াছি।"[১৩]

কিন্তু একথাও সত্যি যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে বাঙালি বৈষ্ণব সমাজে ভক্তিবাদের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। জয়দেব গোস্বামী কৃত 'গীতগোবিন্দ'-এর পূর্বে বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ লীলার কোনো লিখিত নিদর্শন নেই। এই প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য, "আমি আগেও বলেছি, এখনও এই মতে দৃঢ় আস্থাশীল যে, বিবাহ-সম্পর্ক-বহির্ভূত রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়লীলা (যেখানে রাধাকে কৃষ্ণের মাতুলানী বলা হয়েছে, সেই tradition এখনও চলেছে) প্রাকৃত চেতনা ও প্রাকৃত-কাব্যসাহিত্য থেকে অর্বাচীন পুরাণে প্রবেশ করেছে। তবে বাংলাদেশে যেসমস্ত পুরাতন লেখন ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে শুধু এইটুকু অনুমান করা যেতে পারে, খ্রীঃ ৭ম-৮ম শতাব্দী থেকে পূর্বভারতে পুরাণে ও লোকসাহিত্যে কৃষ্ণলীলা সুপরিচিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিষ্ণু-লক্ষ্মী সংক্রান্ত কাব্যকাহিনী লোককল্পনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, বরং ক্রমে ক্রমে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা জনচিত্তকে গ্রাস করে। তবে এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে, জয়দেব প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার কবিরাও রাধাঠাকুরানীর প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। মুসলমান অভিযানের প্রথম যুগ (১৩শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে) থেকে ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত

গৌড়ে রাধাকৃষ্ণ-লীলা ঠিক কোন্ রীতি গ্রহণ করেছিল, তার জন্য প্রধানত মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রহণ করতে হবে। তবে শ্রীচৈতন্যের পূর্বে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সমাজে বিষ্ণু-লক্ষ্মী ও কৃষ্ণ-গোপীলীলার কথা এবং নিম্নতর সমাজে রাধাকৃষ্ণের গোপপল্লীর অনাবৃত অসংযত কামরঙ্গ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।... বিদ্যাপতির গান ও বড়ু চণ্ডীদাসের আখ্যানকাব্যে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে, অবশ্য কৃষ্ণের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছেন রাসরাসেশ্বরী শ্রীরাধা। সুতরাং একথা মনে করা যেতে পারে ১৫শ শতাব্দীর আগে থেকেই বাংলা গান ও কাব্যকাহিনীতে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে।"[১৪] কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব এইসমস্ত কৃষ্ণলীলা বা রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত কাব্যকাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেন। তাঁর প্রভাবেই রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক প্রণয়লীলা ভক্ত-ভগবানের লীলায় পর্যবসিত হয়। তাই চৈতন্য-সমসাময়িক কবি ও মহাজনেরা ও পরবর্তীতে চৈতন্যোত্তর ভক্ত-কবিরা রাধাকৃষ্ণ লীলাকে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির রসে সিক্ত করে তোলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি অন্যতম পার্থক্য হল, পাশ্চাত্য সভ্যতা লেখনী নির্ভর, আর ভারতীয় সভ্যতা শ্রুতি নির্ভর। এইজন্যই পাশ্চাত্য সমাজ, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির একটি লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় যার ফলে ওদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও পরিমার্জনের একটা স্পষ্ট চিত্রের দেখা মেলে। কিন্তু ভারতীয় সমাজে সেই বৈদিক যুগ থেকেই শ্রুতি-নির্ভরতা তথা গুরু-শিষ্য পরম্পরা প্রচলিত বলে এখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইতিহাস অনুপস্থিত। এই কারণেই অধিকাংশ ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনকাল ও কর্মকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট সময় ও পারম্পর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমান-নির্ভর বর্ণনার ওপর ভরসা করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, মুঘল সম্রাট আকবরের সভার অন্যতম নবরত্ন তানসেনের সঙ্গে প্রসিদ্ধ সংগীত গুণী বৈজু বাওরার যে কথিত সাংগীতিক লড়াইয়ের কথা প্রচলিত আছে, তার প্রামাণিকতা নিয়েই সন্দেহের অবকাশ বর্তমান। কারণ, ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনা বিশ্লেষণে বৈজুবাওরা ও তানসেনের বয়সের যে পার্থক্য যুক্তিসঙ্গত বলে মানা যায়, তাতে এই দুই মহাজ্ঞানী সংগীতজ্ঞের মুখোমুখি হওয়া এক কথায় অসম্ভব। অথচ যুগ যুগ ধরে লোকমুখে প্রচলিত হওয়ার ফলে এই কাহিনী অতিশ্রুত এবং অধিকাংশ মানুষের আস্থাভাজন। একইভাবে ভারতীয় ইতিহাস খুঁজলে এমন আরও অনেক অসঙ্গতি ও অবিশ্বাস্য ঘটনা পাওয়া যাবে যা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের প্রামাণ্য-অভাবহেতু অযৌক্তিক অথচ বহুশ্রুত ও প্রচলিত।

চণ্ডীদাস সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথেও প্রধান অন্তরায় এই প্রামাণ্য-অভাব। চণ্ডীদাস নামের আড়ালে যেসব কবিরা বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন তাঁদের কারো ক্ষেত্রেই দিন-কাল-সময়ের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রেও তাঁরা বিস্তারিত কোনো বিবরণ দেননি। তাই, দ্বিজ-আদি-বড়ু-দীন-সহজিয়া প্রভৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ইতিহাস সংরক্ষণে বাঙালির চির উদাসীনতাই এই মহান পদকর্তার মূল পরিচয় বা তাঁর কাজের সাযুজ্য রক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' অনুযায়ী মহাপ্রভু রসাভাসযুক্ত কাব্য প্রবলভাবে অপছন্দ করতেন এবং একাধিক জ্ঞানী ব্যক্তির মতানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পরিকল্পনায়, কৃষ্ণ-চরিত্র সৃজনে এবং বৃন্দাবন খণ্ডের আগের

খণ্ডগুলোতে রাধা-কৃষ্ণের উক্তি, আচরণ ও ব্যবহারে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় যা অলংকার শাস্ত্রানুসারে রসাভাসের নামান্তর। তবে মহাপ্রভুকে কোনো রচনা শোনানোর আগে যেহেতু তাঁর ঘনিষ্ঠ পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর তা পড়ে দেখতেন, তাই এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে তাঁরা মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রসাভাসযুক্ত পদসমূহ বাদ দিয়ে শুধু বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের প্রাণঢালা বেদনার সুরযুক্ত পদসমূহই শুনিয়েছেন যা মহাপ্রভুর বিরহকাতর চিত্তকে শান্ত করেছে।

আবার শাক্তসাধক ও কবি কমলাকান্তের রচিত গীতসমূহ ও পদাবলী প্রসঙ্গে আমরা জানতে পারি যে কবির রচিত মূল কবিতা ও গান মুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণের সময়ে সংগ্রাহক ও সম্পাদক কর্তৃক বারবার পরিমার্জিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "……সুতরাং প্রচলিত মুদ্রিত পদাবলীতে যে মূল কমলাকান্তীয় ভাষার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কমলাকান্তের পদাবলীর ভাষা রামপ্রসাদ অপেক্ষা মার্জিত, তাহার একটা কারণ- পদাবলীর সম্পাদকের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পাঠসংস্কার বা পরিবর্তন।"[১৫] অতএব এই অনুমানও হয়তো নিতান্তই অযৌক্তিক নয় যে চণ্ডীদাসের পদাবলীও পরবর্তীতে সংগ্রাহক তথা লিপিকরদের দ্বারা পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছিল যা আপামর বাঙালি জনমানসকে ভক্তিস্রোতে প্লাবিত করেছিল।

যদিও চণ্ডীদাস সমস্যা বহু প্রাচীন এবং অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী এই গ্রন্থীর জট ছাড়াতে চেষ্টা করেও সম্পূর্ণভাবে সফল হননি। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা মধ্যপন্থার অবলম্বন করে চৈতন্য-পূর্ববর্তী দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু যথাযথ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাস বলে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারকে স্বীকৃতি দিলেও বোধহয় তা অযৌক্তিক হবে না।

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ৩৮৬

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯৭

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪০০

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ২৭৫

৭. বাংলার সংগীত (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)- শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র, সম্পাদনা ড. প্রদীপকুমার ঘোষ, বাংলা সংগীত মেলা কমিটি, কোল- ২০, ২০০৬, পৃষ্ঠা ৭৭

৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ২০০৬-০৭, পৃ. ৩৯৯

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

১০. সঙ্গীতে বাংলা কীর্তনের প্রয়োগরীতি: দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গান, সুদেষ্ণা বণিক, নক্ষত্র প্রকাশন, এ-১৫, নেতাজী সমবায় আবাস, নারায়ণতলা (প:), প্রফুল্লকানন, কলকাতা- ১০১, ২৬ জানুয়ারী, ২০১৫, পৃ. ৮০

১১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ২০০৬-০৭, পৃ. ৩৯৫

১২. পূর্বোক্ত

১৩. পূর্বোক্ত

১৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ২১৭-২১৮

১৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ: ২০০৯-১০, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫